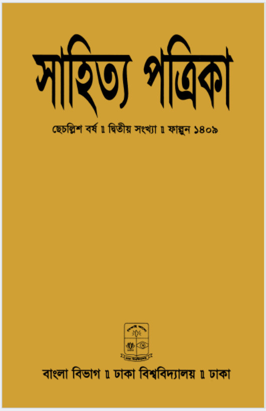

Vol. 46 | No. 2 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শহীদ কাদরীর কবিতায় নগর-প্রতিবেশ ও জীবনচেতনা

Volume	46
Issue	2
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Baitullah Quaderee
Published online	February 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i2.337
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i2.337
Pages	৮৭-১০৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

শহীদ কাদরীর কবিতায় নগর-প্রতিবেশ ও জীব

Check for updates

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী *

নাগরিক কবি হিসেবে শহীদ কাদরীর অবস্থান শুধু বাংলাদেশের কবিতায় নয় বরং সমগ্র বাংলা কবিতাতেই ব্যতিক্রম ও স্বতন্ত্র। উত্তরাধিকার (১৯৬৭), তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা (১৯৭৪), কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই (১৯৭৮) এই তিনটি গ্রন্থে শহীদ কাদরী বাংলা কবিতায় এমন এক নগর-প্রতিবেশ ও জীবনচেতনার ধারক যা তাঁকে এক নিঃসঙ্গ অবস্থানে স্থিত করেছে। বলা আবশ্যক, ষাটের দশকের যে কাল-প্রবাহে শহীদ কাদরীর কাব্যভাষা ও কবিচেতনা নির্মিত হয়, তখন বাংলাদশের নগর বলতে রাজধানী ঢাকার নগরায়ন একবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের। সুতরাং শহীদ কাদরীর কবিতায় যে নগর প্রতিবেশ লক্ষযোগ্য সেটি প্যারিস-লন্ডনের কসমোপলেটিন বর্ণবিভায় বোদলেয়ারিয় ক্লেদ-বিবমিষাময়, এলিয়টিয় অনুর্বরতা এবং বিষণ্ণতায় নির্মিত। বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর নগরই গ্রামীণ নস্টালজিক চেতনা থেকে মুক্ত। বরং তিনি চেয়েছেন নগরকে নগরের মধ্যেই মোকাবিলা করতে। এ কারণেই নাগরিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি নগরকেই আরাধ্য করেন, কখনোই গ্রামীণ ধুলো-ধূসরতাকে নয়। "শহরজীবনকে অন্তরঙ্গভাবে জানেন ও তাকে নিজের বিধিলিপি হিসাবে মানেন শহীদ কাদরী। তিনি হয়েছেন শহরসাধক ও শহর-সভ্যতার উত্তরাধিকারী। ঐ উত্তরাধিকার মহৎ মূল্যবোধের নয়, এমনকি সেটা অর্জনের অনুকূল পরিবেশও নগর তাকে দিতে পারে নি। জন্মসূত্রে তিনি পেয়েছেন হৃদয়-চেতনা হননকারী পীড়াদায়ক পরিবেশ।"[১]

শহীদ কাদরীর কবিতায় যে নগর-প্রতিবেশকে আমরা পাই তার সঙ্গে আমাদের পূর্বোক্ত ঢাকা নগরীর সাযুজ্য খুবই সামান্য। বরং এ নগরচেতনা একটি সুদীর্ঘকালের গড়ে-ওঠা সমৃদ্ধ কসমোপলিটনের উত্তুঙ্গ উৎকর্ষ এবং তা-সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতিতেই একমাত্র সম্ভব। সুতরাং কাদরীর কবিতার নগরচেতনার সঙ্গে বরং শিল্প-বিপ্লবোত্তর লন্ডন প্যারিস নগরীর জীবনচিত্রের

★ সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাযুজ্য বেশি। আসলে আধুনিক কবিতার নগর-প্রতিবেশ আক্ষরিক অর্থে বিশশতকীয় কবিদের হাতেই বিত্রিত হতে থাকে। তার আগে বোদলেয়ার অবশ্য ফরাসি কবিতায় নগর-জীবনের যন্ত্রণাময় আত্ম-নিমজ্জনকে ভাষারূপ প্রদান করেন। মূলত নাগরিক কবিতার সূচিমুখ তৈরি হয় বোদলেয়ারের হাতেই। বোদলেয়ারের নগর এক নারকীয় উল্লাস, ডাকিনী আর প্রেতিনীর উন্মত্ত উরুর শব্দে রাত্রিময়, নপুংসক আত্মায় বেশ্যালয়ে পাপমোচনে প্রশস্ত রাত্রিযাপন। এলিয়ট নগরকে এঁকেছেন উষর, ক্লেদবৈকল্যময়, যুদ্ধোত্তর মানুষের পঙ্গুত্বে প্রায়-ক্লীব এবং সৃষ্টিসম্ভাবনাহীনতায়। 'দ্যা ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এ তার বিবরণ আছে। এলিয়টের প্রুফ্রক কোন ব্যক্তি নন বরং নাগরিক নৈর্ব্যক্তিকতায় নগর-মানসেরই এক উদ্ভট, হাস্যকর, করুণ রূপাবয়ব। এ-কারণেই প্রৌঢ় প্রুফ্রকের প্রেমগীতি নাগরিক উদ্ভটতার আড়ালে কারুণ্যসূচক। সুতরাং শহীদ কাদরীর কবিতায় নগর-চেতনা এসেছে অনেকটা স্বেচ্ছাকৃত, অধীতবিদ্যার আন্তর্সৃজন-প্রক্রিয়ায়; আরেকটু বিশেষভাবে বললে বলা যায় কিছুটা হলেও নাগরিক-উৎকর্ষে উত্তীর্ণ কলকাতা শহরের জীবনচিত্রের একটি ঐতিহ্যের কারণে। এটি এসেছে দ্বিবিধ ধারায়। প্রথমত কবির জন্মস্থান কলকাতা তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে, (এক্ষেত্রে লক্ষণীয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামাঙ্কনও উত্তরাধিকার) দ্বিতীয়ত, তিরিশি কাব্য-বাহিত পশ্চিমবাংলার কবিতার ঐতিহ্যসূত্রে। তা সত্ত্বেও শহীদ কাদরীর কবিতায় নগর-প্রতিবেশ ও জীবনচেতনার উৎসারণে লক্ষ করা যায় ষাটের সময়-পর্বের নখর-দন্ত প্রভাব। বস্তুত প্রথম গ্রন্থেই শহীদ কাদরী স্ব-বৈশিষ্ট্যে আবির্ভুত হন, এবং বাংলা কবিতায় শোনা যায় এক নতুন নগর মূর্চ্ছনা। ষাটের উত্তাল রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবর্তে শহীদ কাদরীর কবিতাতেও ফেলেছে ভারনত ছায়া। সুতরাং শহীদ কাদরীর কবিতার নগর-প্রতিবেশ ও জীবনচেতনার স্বরূপ অনুসন্ধানে ষাটের সময়কালের রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোকপাত আবশ্যক।

আজকের বাংলাদেশের কবিতার সবচে গুরুত্বপূর্ণ ও পল্লবিত শাখাটি হচ্ছে ষাটের সময়পর্বের কবিতা। চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাটের নবীনকবিকুলের বৈচিত্র্যময় আবাহনে ষাটের দশক তুমুলভাবে মুখরিত। চল্লিশ এবং পঞ্চাশের কবিরা সম্প্রসারণ করেছেন নিজেদের নতুন প্রজন্মের পুনর্নির্মাণের মানসিকতায় আবার অন্যদিকে ষাটের আবির্ভূত নতুন কবিবৃন্দ, (যাদের বিকাশ ৬১–৭০ কালপর্বে) সৃষ্টি করলেন নতুন কাব্যস্রোত। বিরুদ্ধ সময়, অবলম্বনহীন অবস্থান, অগ্রজে অবিশ্বাস ক্রমান্বয়ে তাঁদের করেছে সংঘবিচ্ছিন্ন, প্রথাবিরোধী, অবক্ষয়িত

অন্তরাত্মায় নিপতিত। ষাটের কবিদের কাছে অগ্রাহ্য হয়েছে ধর্মবোধ ও নীতিবোধ। জন্মলগ্নেই এঁরা প্রচলিত রীতিতে কাব্যরচনায় অনীহ, স্থির জীবনদর্শনে পরাঙ্মুখ, পূর্ববর্তী কবিদের মতো শুধু ইউরোপীয় আধুনিক নন্দনতত্ত্বে আস্থা রাখতে অনিচ্ছুক। কবিদের এ মানসিকতার মূলে ষাটের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থনীতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল। সম্ভাবনাহীন আইয়ুবী কালোদশক, পাকিস্তানি অখণ্ডতার শ্লোগান, ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, বামপন্থী আন্দোলনের বিভক্তি, আমেরিকান পুঁজির বিস্তারে পূর্ববর্তী কবিদের বিচরণ প্রভৃতি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলিই ষাটের কবিদের মানস-গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এ দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও দারুণ অস্থিতিশীল। আইয়ুব সরকারের দমননীতি, 'মৌলিক গণতন্ত্রী' শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, নতুন শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট প্রকাশে পূর্ববাংলার ছাত্র-আন্দোলন, বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রভৃতির হল্লামুখরতায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। আর এ-সঙ্গে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের খণ্ডিত ভূমিকাও লক্ষযোগ্য। "পুনর্জীবিত হয় ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা এবং অখণ্ড পাকিস্তানের ধারণা। বুদ্ধিজীবীরাও আত্ম বিক্রয় ও প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে গ্রহণ করেন সুবিধাবাদী ভূমিকা। অর্থাৎ ষাটের দশকের এই উপপর্বটি বাঙালি জনগোষ্ঠীর বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে কখনো সদর্থক চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে নি, না সংগ্রামে না চেতনায়।"[২] কারণ "পূর্ববাংলার ছয় দশক পুঁজিবাদীদের শক্তিসঞ্চয়ের গুপ্ত প্রস্তুতিকাল, আর ইউরোপে তা পতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে, সুতরাং অসম সমাজের দুই আদর্শ প্রান্তে জীবনের জ্যা পরাতে অগ্রসর হলেন ছয় দশকের কবিগণ"[৩] সে কারণে কবিরাও সমাজ জীবন ও স্বদেশকে মূল্যায়ন করলেন নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

But We are helpless, simply undone. We have no other alternative except SELF DESTRUCTION. Death is our darling, but no those bloody ladies who are loitering before our eyes.

We are, for no time, interested in politics and newspapers. Then, What do we want? NOTHING, NOTHING,-we want nothing from our bloody society.

We are exhausted, annoyed,tired and sad.'[4]

মূলত 'স্যাড জেনারেশনে'র এই মেনিফেস্টোর মতোই ষাটের কবিরা সমাজ-জীবন-জগৎ ও আপন সৃষ্টিশীলতার বিনাশকে প্রত্যক্ষ করলেন। অবশ্য, ষাটের

কবিদের এ কাব্যপ্রচেষ্টার সূত্রপাত কিছু লিটলম্যাগকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। কণ্ঠস্বর, স্বাক্ষর, সাম্প্রতিক, প্রতিধ্বনি, বক্তব্য, স্যাড-জেনারেশন, যুগপৎ প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনে কবিরা ষাটের সময়পর্বের নতুন অভীপ্সা, জিজ্ঞাসা ও নন্দনভাবনাকে মূর্তরূপ প্রদান করলেন। এ সমস্ত পত্রিকা প্রায়শই ক্ষণজীবী, ব্যতিক্রমী, আপোসহীন ও স্বেচ্ছাচারী। মূলত ষাটের দশকেই যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পরাবাস্তববাদ, প্রকাশবাদ, অস্তিত্ববাদের মতো শিল্প আন্দোলন এবং আমেরিকার বিট জেনারেশনের হতাশাবাদী আন্দোলনও অনুপ্রবেশ করে বাংলা কবিতায়। কৃত্তিবাস বা হ্যাংরি জেনারেশনের জীবনবোধের সঙ্গেও তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন চেতনার ঐক্য। জীবনের সর্বৈব ক্ষুধা মেটানো ও চাহিদা মেটানো অসম্ভব, সুতরাং এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অর্থহীন। এখানে সংবেদনশীল মানব বিপন্ন অস্তিত্বের শিকার। তাই আত্ম-বিধ্বংসী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। "We are not beatniks or angries, remember we are Bipanna. And that is why we are 'Sad'.[৫] এক অর্থে তাঁরা প্রচল সমাজের প্রতি আস্থাহীন। রাজনীতি অর্থনীতি, প্রথাগত প্রেম ও সংস্কারে ষাটের কবিরা বিমুখ। যেহেতু এ সমাজ, অর্থনীতি, বন্ধন ও প্রেম তাদের উদ্দিষ্ট আনন্দ দানে অক্ষম তাই তাঁরা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আত্মমগ্ন থেকেছেন গভীর আত্মরতিতে। সমাজ-রাজনীতি প্রচার মাধ্যমে কবিরা নিজেদের অতিশয় বিপন্ন ভেবেছেন। তাই ষাটের কবিদের কাব্যভাবনায় রয়েছে আত্ম-স্বীকৃতি, পাপবোধ এবং তজ্জনিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার, প্রথাগত সংস্কারের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস। বোদলেয়ারীয় ক্লেদজ নৈঃসঙ্গ্য এবং আত্মরোমন্থন এঁদের কবিতায় বিস্তৃতি পেলেও ঝলসে উঠেছে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, অস্তিত্ব-অভীপ্সু রাজনীতি-চেতনা, যদিও তা সুগভীর জীবন-জিজ্ঞাসিত নয়। পাপবোধে স্থিতি, অন্ধকারে সরীসৃপ অভিব্যক্তি, অপরাধ-প্রবণ মানসিকতা থেকে আত্ম-স্বীকরণ, দেশজ মাটি-মানুষের শেকড়ে লগ্ন হবার মানসিকতা তাঁদের কবিতায় ভাষারূপ পেয়েছে।

ষাটের কবিরা যতই নতুনত্বের দাবিদার কিংবা পূর্বজ-অস্বীকৃত হন, যতই প্রথাবিরোধী হন, তাঁদের রক্তেও প্রবহমান বাংলা কবিতার ধারাবাহিক ঐতিহ্যময় প্রেক্ষাপট। মূলত তিরিশের কবিদের (কিয়দংশ পঞ্চাশ) মধ্যেই তাঁদের কব্যমেজাজ নির্মিত।[৬] ষাটের কবিরা সময়কে দেখেছেন ডালির বিগলিত সময়যন্ত্রের ক্রমভঙ্গুরতায়, সমাজকে দেখেছেন কসমোপলিটন লণ্ডন, প্যারিসের উজ্জ্বল বর্ণবিভায়, শাহরিক জীবনের ছন্দকে আবিষ্কার করেছেন বোদলেয়ারিয় 'ক্লেদজ কুসুম ' ও অবক্ষয়িত অন্ধকারে। একদিকে ইউরোপিয় জীবনদর্শন,

ফরাসি প্রতীকবাদী সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব, অন্যদিকে উৎকেন্দ্রিক জীবন, স্ব-সমাজ ও স্বদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরময় পরিবেশই কবিদের করেছে বৈপরীত্যময়, অবক্ষয়ে নিমজ্জিতকরণ ও বিচিত্রমুখী।

ষাটের নতুন কবিরা যখন কাব্যচর্চা শুরু করেন তখন তাঁদের সামনে উপস্থিত বাংলা কবিতার এক বিশাল দিগন্ত। মূলত তিরিশোত্তর কবিতা ও দুই বাংলার (পূর্ব ও পশ্চিম) চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিদের কবিতা।[৭] "আবার দেশকালগত দিক থেকে আর্থ-সামাজিক পটভূমিও ছিল স্ববিরোধী দুটি কালখণ্ডে বিভক্ত। প্রথমার্ধে কালো দশকের অপশাসনে কবিরা জড়িত হয়ে পড়েন আধাসামন্তবাদী এক সমাজ, দেশ এবং সেই সঙ্গে প্রশাসনিক বাণিজ্যিক কারণে দ্রুত-বর্ধিষ্ণু ঢাকা শহরের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে এঁরা মুখোমুখি হন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রাণস্পন্দনে উদ্দীপ্ত এক স্বদেশভূমির। ফলে পঞ্চাশের কবিদের মতো নতুন আবির্ভূত ষাটের কবিদের চেতনাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে অবক্ষয়ী ও উজ্জীবনী এ দুটি ধারায়।"[৮]

শহীদ কাদরী মূলত প্রথম ধারারই একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। তাঁর কবিতা আক্ষরিক অর্থেই নেতিবাদী জীবন, বোহেমিয়ান ও নাগরিক ক্লেদ, গ্লানি-পঙ্কিলতায় আত্ম-বিধ্বংসীমূলক। এ-কারণেই শহীদ কাদরীর কবিতায় জীবনবোধ, নাগরিকতা, নারীপ্রেম এমন কি প্রকৃতিচেতনাও কার্যকর থেকেছে তাঁর এই নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

'উত্তরাধিকার' এর প্রথম কবিতাতেই শহীদ কাদরী এক ভয়াল বৃষ্টির আগমন ঘোষণা করেন। এ প্রলয়ঙ্করী বৃষ্টির আঘাতে নাগরিক জীবন জর্জরিত,–

রাজত্ব শুধু আজ রাতে, রাজ-পথে-পথে
বাউণ্ডুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মূল, উদ্বাস্তু
বালকের, আজীবন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্ধ-উন্মাদের
বৃষ্টিতে রাজত্ব আজ।[৯]

বোঝা যায়, এ বৃষ্টি-সংবেদনা নিয়ে আসে। নিয়ে আসে নতুন শিহরন ও কাঁপন। প্রাত্যহিকতার চলমানতায় এ যেন করুণ আঘাত। বৃষ্টির তেড়ে-আসা জলে যা কিছু অপসৃয়মান তার ফর্দও যেন বা কবির চেতনায় করুণ এবং তা রোমান্টিকতার অবসানই যেন বা–

ভেসে যায় ঘুঙুরের মতো, বেজে সিগারেট-টিন
ভাঙা কাঁচ, সন্ধ্যার পত্রিকা আর রঙিন বেলুন
মসৃণ সিল্কের স্কার্ফ, ছেঁড়া তার, খাম, নীল চিঠি
লন্ড্রির হলুদ বিল, প্রেসক্রিপসন, শাদা বাক্সে ওষুদের
সৌখিন শার্টের ছিন্ন বোতাম ইত্যাদি সভ্যতার
ভবিতব্যহীন নানা স্মৃতি আর রঙবেরঙের দিনগুলি [১০]

কিন্তু, এ বৃষ্টি কবির বর্ণনায় আরেকটু অর্থবহ ও গাঢ় সংকেতবাহী। কবির নগরজীবনের সূচনাও যেন এ-বৃষ্টির মধ্যে দৃশ্যগ্রাহ্য। সমস্ত ভাসানের গল্পে এক নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের উপস্থিতিও যেন টের পাওয়া যায়–

এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে
নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী।
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভিতরে
ঝকঝকে, সদ্য, নতুন নৌকোর মতো একমাত্র আমি,[১১]

এই নাগরিকতার অনিবার্যতায় আসে একাকিত্ববোধ। সুতরাং সমস্ত কিছুই নিষ্পলক ও করুণ দর্শকের মতো দেখে দেখে নিজের অস্তিত্বেরও বিপন্নবোধ জাগ্রত হয়, আর এক্ষেত্রে এটিই স্বাভাবিক। ভ্রামণিক বোহেমিয়পনা নিয়ে কবি তাই উদ্দেশ্যহীন নিরস্তিত্ব এক নগরেরই দ্রষ্টা, যেখানে স্বপ্নের অবিরাম হাতছানি আছে, প্রলোভন আছে, আছে দীর্ঘ কিউ–

ঢিলে-ঢালা হাওয়ায়-ফোলানো ট্রাউজার, বিপর্যস্ত চুলে
উৎসবে, জয়ধ্বনিতে আমি
ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে, বিজ্ঞানের লাল আলোয়
সতেজ পাতার রঙ সেই বিজয়ী পতাকার নিচে
কিছুক্ষণ, একা
নতুন, সোনালি পয়সার মতন দুই পকেট ভর্তি স্বপ্নের
ঝনাৎকার
আর জ্যোৎস্নার চকিত ঝলক আমার
ঝলসানো মুখের অবয়বে
সিনেমায় দীর্ঘ কিউ-এর সামনে আমি
নব্য দম্পতির গা ঘেঁষে[১২]

শহীদ কাদরীর কবিতায় নগর তার স্বতস্ফূর্ত পরিপার্শ্বসহই উপস্থিত। নগরের দৃশ্যাবলিতে কখনো কখনো উঠে আসে একেটি ক্যারিকেচার। প্রয়াত যৌবনার ভারে ন্যুব্জ নগর যেন আরো বেশি কৌতুকময়, অর্থহীন শুধুই গাল-গল্পের হল্লায় সময়ক্ষেপণের কৌশলে ব্যাপ্ত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত;

১. আমাকে পিছনে রেখে চলে যায় সারে-সারে কত ক্লার্ক
আঙুলে কালির দাগ, মুখে ভয়
টাইপরাইটারে ছাওয়া সারা দেশ, কি মুখর, উন্মুখর
কত না রঙ্গ জানে শো-কেসের সাজানো শেমিজ, শাড়ি
ঝলমলে ছোটবড় ঘড়ি
তিনজন অন্ধবুড়ো জ্যোৎস্নাভরা মাঠে কী কৌতুকে
গালমন্দ পাড়ে
গান ধরে অন্ধকার গলি, 'হে প্রেম, হে আমার প্রেম!'[১৩]
২. জ্যোৎস্নায় বিব্রত বাগানের ফুলগুলি, অফুরন্ত
হাওয়ার আশ্চর্য আবিষ্কার করে নিয়ে
চোখের বিষাদ আমি বদলে নি' আর হতাশারে
নিঃশব্দে বিছিয়ে রাখি বকুলতলায়[১৪]
৩. কেক-পেস্ট্রির মতোন সাজানো থরে থরে নয়নাভিরাম
পুষ্পগুচ্ছের কাছেও গিয়েছি ত' ম্লান রেস্তোরার
বিবর্ণ কেবিনে আশ্রয়ের যে আশ্বাস এখনও
টেবিল ও চেয়ারের হিম-শূন্যতায় লেখা আছে
তেমন সাইনবোর্ড কোন জুঁই, চামেলী অথবা
চন্দ্রমল্লিকার ঝোপে-ঝাড়ে আমি ত' খুঁজেও পেলাম না।[১৫]

উপর্যুক্ত প্রথম দৃষ্টান্তটি গতানুগতিকতার টাইপড হয়ে যাওয়া একটি সময়-পর্বের। কেরানির মতো একমুখী নতজানু জীবনকে তিনি আঁকেন, যেখানে প্রতিবাদহীন, ভারবাহিতার প্রাত্যহিক জীবিকা নিয়ে ন্যুব্জ ও অভ্যস্ত লোকালয়। কিন্তু এর মধ্যে আছে ক্যারিকেচার। আছে নন্দনচর্চার অনর্থক বাড়াবাড়ি।

কেননা– 'কত না রঙ্গ জানে শো-কেসের সাজানো শেমিজ, শাড়ি ঝলমলে ছোটবড় ঘড়ি'। আসলে নাগরিক জীবনের এ ফানুস-সর্বস্বতা নিয়েই মানুষের বেঁচে থাকা। 'ভরা জ্যোৎস্নায় তিনজন অন্ধবুড়োর প্রেমালাপ' যেন অনর্থক সময়ক্ষেপণ, বৈপরীত্যময় নাগরিকতার প্রতিচিত্র। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জ্যোৎস্নার অত্যুজ্জ্বল আলোতে অভিযোজন-অক্ষম পুষ্প যেন কবিরই নিরানন্দ, আত্মার কুণ্ডলায়িত উদ্ভাসন। দীর্ঘ অন্ধকারের পর তিমিরাভ্যস্ত সত্তা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে যেন খুবই বেমানান, বিব্রত। তৃতীয় দৃষ্টান্তে নাগরিক কবির প্রকৃতি-বিরূপতা সুস্পষ্ট। নিসর্গ ও কেক-পেষ্ট্রির মত কঠিন অস্তিত্বময় ফুলের সমারোহ কবির অস্তিত্বের শূন্যতার ঘোষক নয়, বরং নাগরিক চলমানতা ও প্রাত্যহিক বেচাকেনায়, রেস্তোরাঁর টেবিল চেয়ারে, শূন্যতাবোধ ও নিরুদ্দেশ-বাস্তবতায় সেটি অধিকতর স্পষ্ট। এভাবেই শহীদ কাদরী প্রচলিত জীবনের সঙ্গে তাঁর নেতিকে সম্পৃক্ত করেন।

'উত্তরাধিকারে'ই শহীদ কাদরীর নাগরিক বোধ এবং নগরযন্ত্রণা সর্বাধিক প্রতিফলিত হয়েছে। ভাষা-নির্মাণে, শব্দব্যবহারে, নাগরিক কঠিন, নিরেট বস্তুবর্ণনায় শহীদ কাদরী এ-কাব্যে এক ব্যতিক্রমী ইশতেহার-প্রণেতা। শহীদ কাদরীর নগরকে গ্রাস করেছে বোদলেয়ারের কামমত্ত ডাকিনীরা; নষ্ট, নপুংসক বীর্য-গন্ধময় কামুকের উল্লাস তাঁর কবিতার ভাষাকে করেছে নির্মেদ। আলোকিত গণিকাবৃন্দকে কবি লক্ষ করেন বোদলেয়ারের মতনই আত্মশুদ্ধির উপায় হিসেবে।[১৬] 'সে রাতে ছিলাম কদাকার ইহুদিনীর পাশে /পাশাপাশি দুটো মৃতদেহ যেন এ ওকে টানে' (শার্লবোদলেয়ার, সে রাতে ছিলাম) শহীদ কাদরীও নগরের অন্ধকারে প্রদীপ্ত নক্ষত্রের আলোর মতো আবিষ্কার করেন আলোকিত গণিকাবৃন্দকে, 'শহরের ভেতরে কোথাও হে রুগ্‌ণ গোলাপদল/ শীতল, কালো, ময়লা সৌরভের প্রিয়তমা' এ গণিকাবৃন্দ কবিকে অলৌকিক আহ্বানে ডেকে নিয়ে যায়। আর কবির বোধোদয় ঘটে–

> বিকলাঙ্গ, পঙ্গু যারা, নষ্টভাগ্য পিতৃমাতৃহীন,–
>
> কাদায়, জলে, ঝড়ে নড়ে কেবল একসার অসুস্থ স্পন্দন
>
> তাদের শুশ্রূষা তোমরা, তোমাদের মুমূর্ষু স্তন।[১৭]

আর নগরের এ বিপ্রতীপতা যে প্রেমবোধের সৃষ্টি করে তাও রিরংসাময়, শরীরী-উত্তাপের টানে প্রেম, ভোগেরই নামান্তর। প্রেমের সৌন্দর্য ষাটের কবিদের

কাছে উপেক্ষিত। নারী তাদের কবিতায় প্রায়ই আসবাব-সদৃশ মেয়ে মানুষ। কখনো কখনো নারী-সঙ্গ ঘটে গণিকা-সংস্পর্শে। তাই উদ্যানে, ল্যাম্পপোস্টে ঠাণ্ডা, জড় ও মুহূর্তের বাণিজ্যিকী-উপায়েই তাঁদের রিরংসা নিবৃত্তি ঘটে। অসুস্থ, নষ্ট ও অভিশপ্ত নগরে নারীও যেন প্রেমহীন নিরাবেগ এক শরীরী বাসনার মধ্যে চিত্রিত। শহীদ কাদরীর কবিতাতেও এ বোধ প্রবল। বিশেষ করে *উত্তরাধিকার* পর্বের কবিতাগুলোয় তাঁর নারী ও প্রেম চেতনা উপর্যুক্ত মানসিকতাতেই ঘুরপাক খেয়েছে। আসলে ব্যক্তি-অস্তিত্ব যেখানে সঙ্কটাপন্ন সেখানে প্রেমও কোন নিরেট মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে না–

রাত্রে তোমাকে স্বপ্নেও দেখি
গণিকালয়ের সারিতে একা
আমারি মতন হাজার
মুখের মিছিল
তোমার জন্য প্রতীক্ষায়[১৮]

সুতরাং প্রেমের স্থিতি এ পরাধীন উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত শহর দিতে পারে না। যে শহরে 'শৃঙ্খলিত, বিদেশীর পতাকার নিচে আমরা শীতে জড়োসড়' সেখানে প্রেমের প্রস্তাবে টেলিফোনের না-বোধক স্বরই শব্দময় হবে, এটাই স্বাভাবিক ঃ

কালো ডায়ালে আমার আঙুলে ঐন্দ্রজলিক
ঘুরছে নম্বরগুলি,–
শহরের উপর থেকে
দূরদর বাস গাড়ি ঘণ্টাধ্বনি তরঙ্গিত ঘাসে-ভরা
স্টেডিয়ামের ওপর থেকে
আসছে ঃ
না, না, না, – কী জ্যোৎস্না কণ্ঠস্বরে![১৯]

উত্তরাধিকারে শহীদ কাদরী যে-স্বদেশচেতনা পরিস্ফুট হয় তা কবির নাগরিক-বোধ-সঞ্চালিত বাকবিন্যাসে ভাষারূপ পেয়েছে। এক উপনিবেশ শৃঙ্খলিত নগর– যন্ত্রণায় বিদ্ধ কবি আজন্ম অন্ধকার নগরের বাসিন্দা। জন্মাবধি যে স্বদেশ প্রত্যক্ষীভূত তাতে উপনিবেশের ছাপ সুস্পষ্ট। ঔপনিবেশিক শাসকের অন্ধকারে কবির জন্মক্ষণ–

জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ন থেকে নেমে–
সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগরে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্পপোস্টের নিচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু, রুদ্ধচক্ষু সেই ব্ল্যাক-আউট আঁধারে।
কাঁটা তারে ঘেরা পার্ক, তাঁবু, কুচকাওয়াজ সারিবদ্ধ
সৈনিকের। হিরন্ময় রৌদ্রে শুধু জ্বলজ্বলে গম্ভীর কামান,
ভোরবেলা সচকিত পদশব্দে ঝোড়ো বিউগুলে
গাছ-পালা, ঘরবাড়ি হঠাৎ বদলে গেছে রাঙা রণাঙ্গনে।[২০]

শহীদ কাদরীর কবিতায় এভাবেই উত্তরাধিকারে-প্রাপ্ত এক ঔপনিবেশিক নগরকে পাওয়া যায়। এ নগর কবির বোধের বিপ্রতীপ, শত্রুভাবাপন্নপ্রকৃতির সৌন্দর্য-তিরোহিত এক অভিশপ্ত নগরী। এ নগরে রাত নামে অবলীলায়। রাত্রি-পিয়াসী লোকজন তিমিরের মধ্যেই তাদের মুখোশ এঁটে সটকে পড়ে। আসলে জাতীয় জীবনের অস্থির দুর্বিষহ, দিক্‌চিহ্নহীন অমানিশাকেই শহীদ কাদরী প্রতি তুলনা করেন রাত্রির অনুষঙ্গে। সেই রাত আবার গভীর তিমিরাচ্ছন্ন নয়। অস্ফুট জ্যোৎস্না, কখনো কখনো জ্যোৎস্নার তীব্র আলোক বিচ্ছুরণে কদর্য রাত্রির উদ্ভটতাকে প্রকাশ করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ

১. রাত্রে চাঁদ এলে
লোকগুলো বদলে যায়
দেয়ালে অদ্ভুত আকৃতির ছায়া পড়ে
যেন সারি সারি মুখোশ দুলছে কোন
অদৃশ্য সুতো থেকে
আর হাওয়া ওঠে ধাতুময় শহরের কোন্ সংগোপন ফাটল
কিংবা হা-খোলা তামাটে মুখ থেকে
হাওয়া ওঠে, হাওয়া ওঠে
... ...
কেউ ঢোকে পার্কে, খোপে-ঝাড়ে কিংবা
নেমে যায় পিচ্ছিল কৃমির মত
স্বপ্নের সুরঙ্গপথে
সহজ, অবাধ; ঠোঁট ফাটে.. ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে[২১]

২. কিন্তু দৃষ্টিহীন আকাশ ক্রমে নেমে এল
বিস্বাদে পীতাভ
এবং গেঁথে রইল জানালার মরচে-পড়া সারি সারি শিকে
যেন আমার মৃত অশ্বের ছাল টানিয়েছে কেউ
অকরুণ রোদ্দুরে।[২২]

৩. প্যাঁচার তীব্র চিৎকার
যেন এই রাত্রির শরীরের ওপর,
বিস্তর আঁচড় রেখে যাচ্ছে।
কোন সংগোপন উৎস থেকে বেরিয়ে আসছে
অনর্গল ছেঁড়া-খোঁড়া দৃশ্যগুলো;
একটা মদির অশ্ব বারবার লাফিয়ে উঠছে
বাতাসে শূন্যতায়,–
বাগানে ঝুলন্ত চাঁদ জবার মত লাল।[২৩]

প্রথম দৃষ্টান্তে নগরীর রাত একটি বিপ্রতীপ সময় ও রূপান্তরের ধারক। দিনের আলোকের সঙ্গে এ রাতের পার্থক্য মেরুদূর। রাতের অন্ধকারের সঙ্গে বদলে যেতে থাকে মুখোশ; ইট-পাথরের ধড়হীন ধাতব শহরের ফাটল থেকে ওঠে এক সর্বনাশী হাওয়া। ষড়যন্ত্রময়, কুহকী এবং ভৌতিক শহরে যার যার মতো করে অশরীরী মাত্রায় ভিন্ন জীবন ও জগৎ এক অশুভ সুড়ঙ্গের মধ্যে নিপতিত হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দৃষ্টিহীন রাত্রির আকাশ অন্ধত্বের প্রতীক। আর কবির চেতনার অশ্বটির বিভৎস পরিণামও লক্ষযোগ্য। তৃতীয় দৃষ্টান্তে রাত নিঃসন্দেহে অশুভ। প্যাঁচার চিৎকার ও আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত আর কবির চেতনা বোধের অবাধ ঘোড়াটি শূন্যে আস্ফালন করে যায়– যেহেতু চাঁদের রোমান্টিক অনুভবের বদলে তা রক্তাক্ত, সম্ভবত একটি বৈপ্লবিক চেতনাকে ধারণ করেই।

নাগরিক নিঃসঙ্গতা নাস্তি ও মনোবিকলন এক পর্যায়ে দুঃখবোধকে উদ্বুদ্ধ করতে বাধ্য। সেই সঙ্গে আনে অপরাধবোধ। স্বীকারোক্তিমূলক মানসিকতাও এর মূলে সক্রিয়। ষাটের কবিতার একটি বড় বৈশিষ্ট্য এ স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার প্রথম সচেতন প্রয়াস এ দশকের কবিদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু নাগরিক বৈপরীত্যময় পরিবেশ রয়েছে সুতরাং সেখানে অপরাধবোধও তীব্র আর

তার স্বীকারোক্তিও একটি দার্শনিক মাত্রায় উত্তীর্ণ হবে এটি বলা বাহুল্য। শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, আবুল হাসান প্রমুখের কবিতায় স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমেরিকান কবিরাই এ-ধরনের কবিতার নির্মাতা। স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় রবার্ট লাওয়েল, অ্যান সেক্সটন, সিলভিয়া প্লাথ প্রমুখের কবিতায়। বাংলাদেশে ষাটের কবিরাও তার সার্থক প্রয়োগ ঘটান। শহীদ কাদরীর কবিতাতে নগর-প্রতিবেশ, স্বকাল ও সময়ের অনিবার্য পরিণতি, ব্যক্তি অস্তিত্বের বিপন্নতা, অভিযোজনগত সমস্যা ও তা থেকে সৃষ্ট অন্তর্দহন থেকে স্বীকারোক্তিপ্রবণতা কাজ করেছে–

> সৎসঙ্গ লাগে নি ভালো? সজ্জনের কথা?
> কৃমিও যায় না যেই দুর্গন্ধের নর্দমায়, পাকে
> সেখান ভাসালি বুক?[২৪]

তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা (১৯৭৪) গ্রন্থে শহীদ কাদরী একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানান। এ গ্রন্থে কবির চেতনা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিকাল এবং যুদ্ধকালীন চেতনা, এবং যুদ্ধোত্তর জীবনের অনুভূতিকেই ভাষারূপ দিয়েছেন। পূর্বের গ্রন্থের ভাষাবোধ ও নেতিমূলক নগর-যন্ত্রণা এ গ্রন্থে কিছুটা শমিত। ধীরে ধীরে শহীদ কাদরী একটি সুস্থিত রাষ্ট্রের মধ্যে তাঁর চেতনার বীজকে রোপণ করেন। কবির চেতনায় জাগ্রত হয় রাষ্ট্রচেতনার সুস্থিত বিশ্বাস–

> রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে স্বাধীনতা দিবসের
> সাঁজোয়া বাহিনী
> রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে রেসকোর্সের কাঁটাতার,
> কারফিউ, ১৪৪-ধারা[২৫]

শহীদ কাদরীর এ পর্বের কাব্যভাষায় যুক্ত হয়েছে স্বদেশচেতনার মর্মমূল থেকে উঠে আসা প্রত্যক্ষ উত্তাপময় বাক-বর্ণনারীতি। নাগরিক নির্বেদ, বস্তুবর্ণনাময় ভাষা এবার যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতায় পেয়েছে ভিন্নতর মাত্রা। কবি এখন এ নগরীতে একাকী নন। নগর-যন্ত্রণায় বিদ্ধ কবির চেতনা কোনো ঘেঁয়ো-জীবনের সারাৎসার বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কবি এখন মুক্তি সংগ্রামের জার্নাল নিয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর। নাগরিক বর্ণনায় এ-পর্বে যুক্ত হয়েছে জার্নালিস্টসুলভ বর্ণনারীতি–

শহর ছেড়ে চলে যাবে সবাই
(এবং চলে যাচ্ছে দলে দলে)
কিন্তু এই ধ্বংস স্তূপ স্পর্শ করে আমরা কয়েকজন
আজীবন রয়ে যাবো বিদীর্ণ স্বদেশে, স্বজনের লাশের আশে পাশে।[২৬]

স্বদেশচেতনা এ পর্বে শহীদ কাদরীকে জন-সম্পৃক্ত করে। কবির কাছে স্বদেশ এক নতুন প্রেরণা–

একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ
আমার কনিষ্ঠ আঙুলে, কখনও উদ্ধত তলোয়ারের মতো
দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোরাকাটা
জ্বলজ্বলে রূপ জ্যোৎস্নায়।[২৭]

ফলত এ পর্বের প্রকৃতিও কবির চেতনায় প্রতীক ও রূপকময়। এবারের নিসর্গ কবির কাছে শক্তির উৎস। কারণ নিসর্গের ক্ষয়িষ্ণুতায় নয় বরং এর উজ্জীবনী শক্তি থেকেই ধার করা যেতে পারে শক্তি। স্বাধীন দেশের নাম লেখার জন্যই প্রয়োজন প্রকৃতি-সান্নিধ্যতা–

তোমার নাম লেখার জন্যে আমি
নিসর্গের কাছ থেকে ধার করছি বর্ণমালা–
আগুন, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, ঝড়– আর
সভ্যতার কাছ থেকে– একটি ছুরি
– এই সব অক্ষর দিয়ে তোমার নাম আমি লিখছি, তোমার নামঃ
অগ্নিময় বৃষ্টিতে তুমি ঠাণ্ডা, হিম, সোনালি ছুরি প্রিয়তমা![২৮]

আর যুদ্ধকালীন গেরিলার অতর্কিত উপস্থিতি যেন পাখির রূপকে মাত্রা পায়–

চেকপোস্টের কাছে দীর্ঘ কিউ– নতমুখে দেহ-তল্লাশির পর
দোকান খুলবে কেউ, আপিস পাড়ায় যাবে কিম্বা ফিরবে ঘরে।
মাথার ওপরে শুধু ক'টা পাখি উপেক্ষা করছে সব মানা
অসম্ভব স্বাধীনতায় আকাশে উড্ডীন দেখি
আইডেন্‌টিটি কার্ডহীন ডানা॥[২৯]

'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' কবিতায় স্বদেশরূপিনী প্রিয়তমাকেই অভিবাদন জানাচ্ছেন আর স্বপ্নের স্বগতোক্তির মতোই প্রিয়তমাকে আশ্বস্ত করছেন তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্নের রাষ্ট্রের, যেখানে কবি, শিল্পী, গায়ক এবং বুদ্ধিজীবীরাই হবে ঐ রাষ্ট্রের কর্ণধার। যেখানে মুদ্রাস্ফীতির বদলে শিল্পোত্তীর্ণ কবিতার সংখ্যাই বাড়বে। আমাদের মনে পড়ে, প্লেটো যেখানে আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদেরকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, শহীদ কাদরী সেখানে কবিদেরকেই করছেন রাষ্ট্রের কর্ণধার। আসলে এ কবি সত্যদ্রষ্টা, জনদরদী, নেতৃত্বসুলভ জনপ্রতিনিধিরই নামান্তর–

ভয় নেই, ভয় নেই
ভয় নেই... আমি এমন ব্যবস্থা করবো
একজন কবি কমান্ড করবেন বঙ্গোপসাগরের সবগুলো রণতরী
এবং আসন্ন নির্বাচনে সমরমন্ত্রীর সঙ্গে প্রিয়তমা![৩০]

কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই (১৯৭৮) গ্রন্থে শহীদ কাদরী যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের এক স্থবির বাকরুদ্ধ, বৃত্তবন্দী স্বদেশের চিত্র এঁকেছেন। প্রার্থিত স্বাধীনতা কবির আশাকে রূপদানে ব্যর্থ হয়েছে। এক অপরাধ ও গ্লানিবোধ কবির এ পর্বের কবিতায় ভাষারূপ পেয়েছে। কবির উত্তরাধিকার-পর্বের নাগরিকতাবোধ এবং বোহেমিয়চেতনাও এ পর্বে অনেকটা তিরোহিত। নৈর্ব্যক্তিক দ্রষ্টা থেকে কবি এ পর্বে নগরের খাপ-খাওয়া প্রাত্যহিক মানুষই যেন বা। এক ধরনের ক্লান্তিজনিত অপরাধবোধ কবির সময়কে গ্রাস করতে উদ্যত। নতুন রাষ্ট্রে অস্তিত্ববিষয়ক সঙ্কট তীব্র না হলেও আছে স্বপ্নভঙ্গ। এ রাষ্টের বাতাস সীমাহীন পুলিশি ভূমিকায় নিয়োজিত, শালিক পেয়েছে গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ– 'আজ সকাল থেকে এক জোড়া শালিক/ গোয়েন্দার মতো আমার/ পেছনে পেছনে ঘুরছে/ যেন এভিনিউ পার হয়ে নির্জন সড়কে/ পা রাখলেই আমকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে ঠিক!' (আজ সারাদিন)। সুতরাং যে আশা ও সঞ্জীবনী সুধায় উত্তরাধিকার-পর্বের শহীদ কাদরী তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমায় দেশমাতৃকার তন্তুবয়নে লিপ্ত হন, এবং বলেন– 'ভয় নেই/ আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সেনাবাহিনী/ গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে/ মার্চপাস্ট করে চলে যাবে/ এবং স্যালুট করবে তোমাকে প্রিয়তমা।' (তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা), সেই কবিই কোথাও কোন ক্রন্দন নেই গ্রন্থে এক তীব্র অপরাধবোধে জর্জরিত–

'তুমি অপরাধী'
–এই কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যেন
বলে গেল বজ্রসহ এক পশলা হঠাৎ বৃষ্টিপাত–
'তুমি অপরাধী–
মানুষের মুখের আদলে গড়া একটি গোলাপের কাছে।'[৩১]

আসলে এ গোলাপ সুন্দর ও মানবতার প্রতীক মানুষের আদল নিয়ে যে-গোলাপ কবিচেতনায় প্রতিভাসিত সেটি কবির বোধের বিপ্রতীপ শক্তির দলনে বিধ্বস্ত। কবির হাত রক্তরঞ্জিত আগামেমননের রক্তের মতই। যেন এ অপরাধ পিতৃহত্যার প্রবল অনুশোচনা ও পাপবোধে পঙ্কিল, আর তাই কবির সৌন্দর্যবোধের বিপ্রতীপ সকল অসুন্দরের মধ্যে কবি যেন অনেক দিন পর আবারো উদ্বাস্তু–

আমি অনেকদিন পর একজন হা-ঘরে
উদ্বাস্তু হয়ে চরকির মতো গোটা শহর ঘুরে বেড়ালাম।[৩২]

এ পর্বের কবিতায় শহীদ কাদরীর নাগিরিকবোধ অনেকটাই সংযুক্ত হয়েছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আবর্তনে। কবির নস্টালজিক চেতনায় যে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক তাতেও আছে নাগরিক প্রলেপ–

আমি তোমাদেরই দিকে যেতে চাই
ঝক্‌ঝকে নতুন একটি সেতু
যেমন নদীর পাড় দাঁড়ানো ঐ লোকগুলোর কাছে পৌঁছে যেতে চায়
কিন্তু তামা ও পিতলসহ বাসন-কোসন, চিঁ-ড়গুড় ইত্যাদি গোছাতে
তোমরা ব্যস্ত, বডড বেশি ব্যস্ত।[৩৩]

লক্ষণীয়, উদ্ধৃতাংশে কবি যে ঝক্‌ঝকে সেতু-সংযোগের মাধ্যমে গন্তব্যমুখী হতে চান তা শাহরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নগর থেকে প্রত্যক্ষীভূত নাগরিক কবির অনুভূতি বিশেষ। এই সেতু নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে নতুন জীবনবোধের প্রতীক। কিন্তু কবির বোধের সঙ্গে অন্যদের বিশাল ব্যবধানই কবির প্রত্যাবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে।

তাহলে কবি যে চেতনাকে ধারণ করে একটি গোলাপ আগলে রাখতে চান–(অনেক মৃত বালকের কলরোল সঙ্গে নিয়ে এসেছে এ গোলাপ) তাকে তিনি প্রত্যহের রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ করেন এভাবে–

মাথার ওপরে ক্রমাগত গর্জমান এ্যারোপ্লেন,
জেটিতে নড়ছে ক্রেন, চতুর্দিকে ভাসছে রণতরী
স্মৃতির ভেতরে ফের খুলে যাচ্ছে কোষবদ্ধ এক
নিপুণ তরবারি, চতুর্দিক থেকে যদি ট্রেন
সমরাস্ত্র নিয়ে আবার দাঁড়ায় এ-শহরে, যদি ফের
কুচকাওয়াজের শব্দে ঝরে যায় আমার দিন আর রাত,
চেনাজানা সকল ফুটপাত, তখন লুকাবো তাকে
কোন গঞ্জে?[৩৪]

অর্থাৎ, প্রার্থিত অর্জন এখনও আসে নি। নগরে এখনও তাড়িয়ে বেড়ায় যুদ্ধের স্মৃতি। সমরাস্ত্রের ঝনঝনানিতে কবির চেতনায় যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাও অবসিত হয় নি। তাই প্রাত্যহিক রণাঙ্গনেই কবি সৌন্দর্য নির্মাণের কথা ব্যক্ত করেন। নাগরিক কবি আজ নগর দেখতে দেখতে ক্লান্ত, অবসন্ন। একই দৃশ্য একই নরক-সদৃশ নিয়তি কবির নগর-যন্ত্রণাকে তীব্র করে তোলে। আশৈশব নাগরিক কবির অভিজ্ঞতা কবিকে দিয়েছে প্রবল নাস্তিচেতনা। এক উন্মূলচারী মানুষ হিসেবে নগর তাঁকে কোথাও আত্মসমর্পণের বিশ্বাসে স্থিত হতে দেয় নি। মূল্যবোধ, প্রেম, ধর্ম ও সামাজিক লোকাচার কবির নাগরিক জীবনে তিরোহিত। একজন আধনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে তাঁর প্রেমবোধে যুক্ত হয়েছে (মৌহূর্তিক চেতনা ও রিরংসাবোধ। ফলত তাঁর প্রেমবোধও খণ্ডিত। আর এ জন্যই কবির স্পষ্ট উচ্চারণ–

যারা গাঁও-গেরামের মানুষ,
তাদের গ্রাম আছে, মসজিদ আছে
সেলাম-প্রণাম আছে।
আমার সেলামগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে একজন সমরবিদ,
আমার প্রেমের মূল্য ধরে টান মারছে অন্তরঙ্গ বিজ্ঞানী
আমার প্রাণ নিয়ে লোফালুফি করছে কয়েকজন সার্জেন্ট-মেজর
কেবল নিজের ছায়ার কাছে নতজানু হয়ে পড়ে থাকবো আমি
আর কতদিন?
এখন তোমার সঙ্গে ক্ষেত-খামার দেখে বেড়াবো।[৩৫]

শহীদ কাদরীর কবিতা এভাবেই এক আত্ম-স্বীকারোক্তিমূলক জীবনচেতনার দিকে প্রধাবিত করে। আজীবন লালিত নগর কবির অভিজ্ঞতায় যে জীবনবৃত্তের নির্দেশনা দেয় তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় কবির স্বদেশচেতনা, প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনার নিভৃত অভীপ্সাসমূহ। আমরা বুঝতে পারি, শহীদ কাদরীর নগরে নখর ফেলে গেছে আমাদের জাতীয়-জীবনের ভয়ানক ঘটনাসমূহ। মুক্তিযুদ্ধকালীন, ক্ষুধা, মারী ও মড়ক, বুটের আওয়াজ, বেয়োনেট, ও গোলাবারুদের গন্ধ। তাঁর নরকপ্রিয়তা এ কারণেই একটি ইতিবাচক জীবনসন্ধিৎসার মানসিকতা থেকেই উৎসারিত বলে প্রতীয়মান হয়–

যুদ্ধ হত্যা মারী ও মড়ক
তবুও বলি না খিন্ন স্বরে,
'যাক চুলোর ভিতরে যাক এই মরলোক'
হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকি নিজের বিবরে
জীবনের নাম শুনে থুতু ছুঁড়ে 'নরক! নরক!'
অনেকেই বলে গ্যালো, আমি শুধু বলি;
নরক তো পিতার শিশ্ন, মায়ের জরায়ু
নরকেই পেতে চাই দীর্ঘ পরমায়ু।[৩৬]

২.

শহীদ কাদরীর কবিতার প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে এ বিষয়টি পরিস্ফুট হয় যে, তাঁর কাব্যভাষা, শব্দ-নির্বাচন, উপমা-প্রতীক-চিত্রকল্প নির্মাণের কৌশল সবকিছুই আহরিত হয়েছে নিরেট নাগরিকবোধ ও নগর-অনুষঙ্গ থেকে। নগরের কঠিন, নিরাবেগ, প্রাত্যহিক বস্তুবর্ণময় জীবনের গভীর অনুরণন তাঁর নাগরিক-মননকে ঘিরে। স্বদেশচেতনা, ব্যক্তিপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ, রাষ্ট্রবোধ প্রভৃতি বিষয় এলেও সেখানে বৃহত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্যানভাস সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। বরং শহীদ কাদরী যে নগরের বাসিন্দা তারই নিরেট বাস্তবতায় কবির চেতনায় আমাদের জাতীয়জীবনের ঘটনাবলি তাঁর কবিতায় ছাপ ফেলে গেছে। সেজন্যই তিনি যখন যুদ্ধকালীন বর্ণনা দেন তখনও নগরের কার্ফু, বুটের আওয়াজ, কাঁটাতারের ব্যারিকেড ইত্যাদির এক ঘনীভূত নগর-বেষ্টনীর বর্ণনা ভাষারূপ পায়।

শহরের চিত্রকল্প এলিয়ট এঁকেছেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর উষর মরুভূমিতে, অন্ধ গলি, কানা বেড়াল ও স্যাঁতসেঁতে বিরূপ পরিবেশে। বোদলেয়ার প্যারিস নগরীর বিবমিষা তাঁর জীবনক্লান্তিতে যুক্ত করেছে বিষাদ, নির্বেদ, মৈথুনক্লান্ত বিষণ্নতা। শহীদ কাদরীর কবিতাতেও শহরের চিত্র একই বোধ থেকেই নির্মিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত–

১. সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগরে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্প পোস্টের নিচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু[৩৭]
২. সম্ভবত তিনদিনের বৃষ্টি
তার স্বপ্নের দেয়ালে হলদে স্যাঁতসেঁতে চিত্র রেখেছে[৩৮]
৩. কেবলই দেখিয়ে যায়, গহ্বর, কবর আর ম্লান
পাণ্ডুর রোগের রাত স্বপ্নহীন শীতার্ত শয্যায়;
প্রিয়তম মহিলার উদ্বিগ্ন, করুণ, রাগী স্বর–
নাকে মুখে নম্র নখের আঁচড়, – বৃষ্টির ঝাপট,–[৩৯]

প্রথম দৃষ্টান্তে কবি যে শহরের চিত্র আঁকেন সেটি সম্পূর্ণভাবে এক ক্ষয়িষ্ণু, অবক্ষয়িত এবং নিষ্ফলা, সৃষ্টিহীন সময়ের নগরচিত্র। দ্বিতীয় দৃষ্টন্তে বৃষ্টির অবিরাম ধারায় স্বপ্নের দেয়ালে যে স্যাঁতসেঁতে চিত্র জমে তার মধ্যে হৃদয়-বৈকল্যের অনুভূতিসহ দৃশ্যাত্মক চিত্রকল্প রূপয়িত হয়েছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে অশুভ রাতের চিত্র কবির অনুভূতিতে কবরের স্তব্ধতা নিয়ে উপস্থিত। বোদলেয়ারিয় জীবনচেতনার মতোই কবির পাণ্ডুর বিবর্ণ, হিম-হাওয়া শয্যাপাশে প্রিয়তম অঙ্কশায়িনীর বৈপরীত্যময় চিত্রাত্মক বর্ণনা নগরের জীবনযন্ত্রণাকে প্রকট করে তুলেছে।

শহরচিত্র আঁকার পাশাপাশি শহীদ কাদরীর কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকল্প। ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকল্প কবিচেতনের গহন অঞ্চলের সংবিদনশীল প্রকাশ। বহির্জগতের দ্বন্দ্বময়, অভিঘাতে অন্তর্জগতের সঙ্কোচন এবং প্রতিক্রিয়াতেই ইম্প্রেশনিজমের সূচনা। সুতরাং এ মতবাদে শিল্পীর মনোচেতনার স্ফুরণ প্রাধান্য পায়, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিশেষ আবহ গুরুত্ব পায় প্রকাশ ভঙ্গিতে। বাস্তবের হুবহু অনুকৃতি নয় বরং প্রাণময় সত্তার স্পন্দিত, অনুরণিত, পুষ্পিত প্রকাশই এ ধারার প্রধান প্রবণতা। 'অর্থাৎ জাগতিক বস্তুকে এক অতিজাগতিক অনুভূতির বলয়ে উত্তীর্ণ করে দেওয়াই এর অভিপ্রায় এবং এ উত্তরণে গভীরতর অন্তর্জীবনের স্পন্দনই সদাসঞ্চরণশীল এক সত্তায় পর্যবসিত হয়। এটাকে বলা চলে আত্মগত দৃষ্টিশক্তির স্বয়ম্ভর প্রকাশ।'[৪০] ইম্পেশনিস্ট চিত্রকল্পে কোমল, মৃদু, সঞ্চরণশীল ও গতিমান সময়বিন্যাসকে দেখানো হয়ে থাকে। কবির মনোজাগতিক রূপান্তর, অভ্যন্তর প্রতিক্রিয়া বিবৃত হয় আলোর প্রতিসাম্যে–

যে রুটিতে ঝরে না ঝর্ণার মতো, মেশে না তোমার
স্তনের লবণ আমি তাকে কোথাও দেখি না
খুঁজি না কখনো। তোমার বিহ্বল হৃদ ছাড়া
আর কোনো স্নানও জানি না[৪১]

শহীদ কাদরীর কবিতায় প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে কবির নিরস্তিত্ব চেতনার অনুষঙ্গে, কখনো নাগরিক যন্ত্রণায় রূপায়ণে প্রতিরূপকরূপে আবার কখনো ক্লেদাক্ত জীবনের অনুষঙ্গরূপে। ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকল্পের সঙ্গে প্রতীকী চিত্রকল্পের সংমিশ্রণও তৈরি করে নতুন ভাবচেতনা।

১. আগুন বৃষ্টি বিদ্যুৎ ঝড়- আর
সভ্যতার কাছ থেকে- একটি ছুরি
- এইসব অক্ষর দিয়ে তোমার নাম আমি লিখছি, তোমার নামঃ
অগ্নিময় বৃষ্টিতে তুমি ঠাণ্ডা, হিম, সোনালি ছুরি প্রিয়তমা![৪২]
২. লম্বা লম্বা সরু বৃষ্টির আঙ্গুল লোকটাকে হাতড়ে দেখছে
তার জ্বলজ্বলে জামা শপশপে ভেজা[৪৩]
৩. দেখলাম একটা শাদা চকচকে মাছ
প্রাচীন মসজিদের মতো বয়োবৃদ্ধের
বড়শীতে গাঁথা পদ্মপুকুরে
ঘর-ফেরা সন্ধ্যায়[৪৪]

প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে অগ্নি ও বৃষ্টির ব্যবহার যুগপৎ ধ্বংস ও সম্ভাবনার। অগ্নি কবি-অস্তিত্বের সংহারক অনুষঙ্গরূপে প্রতীকায়িত। প্রবৃত্তির অন্তর্দহন, সৃষ্টিশীল আত্মার জ্বালা, অস্তিত্বের বিপন্নতা ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অগ্নির ব্যবহারকে করেছে বৈশিষ্ট্যময়। সৃষ্টিসম্ভাবনাহীনতাও অগ্নির দাহিকাশক্তিরূপে রূপায়িত হয়েছে। আর বৃষ্টি ব্যবহৃত হয়েছে ফলবন্তার প্রতীকে। বৃষ্টি-প্রত্যাশী কবি অন্তরের প্রজ্বলিত অগ্নি-নির্বাপণে বৃষ্টিকেই আরাধ্য করে তোলেন। তৃতীয় দৃষ্টান্তে ব্যবহৃত হয়েছে ইম্প্রেশনিস্টিক চিত্রকল্পের সঙ্গে প্রতীকী চিত্রকাল্পে। 'মাছের' বয়োবৃদ্ধের বড়শিতে আটকে যাওয়া কবির সমর্পিত আত্মার ভ্রান্তিময় কালক্ষেপণ বিবৃত হয়েছে। নতুন মূল্যবোধের উজ্জ্বল চক্ষুষ্মান এই মাছ প্রাচীনের অর্থাৎ অনগ্রসর চৈতন্যের টোপ গিলে বর্তমানে আত্মমগ্ন। এ চিত্রকল্পটি পরাবাস্তব চেতনাবাহী। কিন্তু ঘরফেরা সান্ধ্যকালীন ধূসর ধূম্রতার আলোর বিহ্বল প্রচ্ছায়ার উল্লেখে ইম্প্রেশনিস্ট মাত্রাও এর সঙ্গে সংযোজিত হয়। আর 'চকচকে মাছ'হয়ে ওঠে কবির অনভিজ্ঞতা, তারুণ্যের উজ্জ্বলতার প্রতীক।

কবির উপমালোকও নির্মিত হয়েছে নাগরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনুষঙ্গ থেকে। সময়ের স্থবিরতা, দ্বন্দ্ব, আত্মপ্রকাশের নতুন দিগন্ত সন্ধানের প্রেরণা, অন্ধকার

পঙ্কিল জীবনের নিঃসঙ্গতায়, ক্ষতার্ত সমকালের রূপব্যঞ্জনায় শহীদ কাদরীর উপমাগুলো পেয়েছে ভিন্নতর মাত্রা।

১. শর্করার মতো রাশি রাশি নক্ষত্র বিন্দুর স্বাদে
রুচি নাই।[৪৫]

২. আর আমি শুধু আঁধার নিঃসঙ্গ ফ্লাটের রক্তাক্ত জবার মতো[৪৬]

৩. নেমে যায় পিচ্ছিল কৃমির মতো
স্বপ্নের সুড়ঙ্গ পথে[৪৭]

প্রথম দৃষ্টান্তে নক্ষত্রবিন্দুকে নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বাস্থ্যসচেতন মানসিকতায় শর্করাভীতির উপমায়ন নিঃসন্দেহে নতুন ও নগরচেতনাপ্রসূত, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ফ্ল্যাটের নিঃসঙ্গতায় রক্তাক্ত জবা কবির অন্তর্দহনের সঙ্গে প্রতিতুল্য। শেষ দৃষ্টান্তে নাগরিক মধ্যবিত্তের অস্তিত্বপ্রয়াসী চেতনা পিচ্ছিল কৃমির উপমায়নে এক রহস্যময় সঙ্গোপন আত্মকেন্দ্রিক সময়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

শহীদ কাদরীর কাব্যভাষাও তাঁর নাগরিক জীবনবৃত্তের অভিজ্ঞতা থেকে আহরিত। নাগরিক অনুষঙ্গবহ শব্দ, নিরেট, নির্মেদ ভাষাভঙ্গির সঙ্গে প্রতিকোৎসারী ভাষার সমন্বয় তাঁর কবিতাকে দিয়েছে দার্ঢিক সংহতি, কাব্যিক আবেগ ও প্রবহমানতা। নাগরিক শব্দাবলির সংমিশ্রণে কবিচিত্তের সংহত পরিণত আবেগ সৃষ্টি করেছে নৈর্ব্যক্তিক ঢং। কখনো কখনো ইংরেজি বাকবিন্যাস, শব্দের প্রয়োগ, কবিতায় দিয়েছে নতুন মাত্রা–

মাথার ওপরে ক্রমাগত গর্জমান এ্যারোপ্লেন
জেটিতে নড়ছে ক্রেন, চতুর্দিকে ভাসছে রণতরী[৪৮]

এই ভাষার সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে কথ্য ভাষা ও তৎসম শব্দ। নাগরিক শব্দাবলির সঙ্গে কথ্যভাষার মিশ্রণ শহীদ কাদরীর কবিতার ভাষাকে দিয়েছে আটপৌরে ও প্রাত্যহিক চরিত্র। এই কথ্যভাষার ব্যবহারে হার্বার্ট রিড কথিত জীবনের 'গতি ও পেষণ' তাঁর কবিতায় অনিবার্য উপাদান হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে।[৪৯] তাঁর কবিতাও হয়ে উঠেছে কথ্যগন্ধী, গাদ্যিক সুষমামণ্ডিত–

১. নীলাভ আকাশে ওড়া শাদা বগার মতন ক্রন্দন-পেরুনো কোনো ঘুড়ি?[৫০]

২. দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো হে সাঙাৎ
কী ইংরাজি জানে অই চাঁদ[৫১]

শহীদ কাদরীর কবিতায় প্রতিফলিত নগর-প্রতিবেশে, তাঁর আত্মপীড়নমূলক স্বীকারোক্তিপ্রবণ মানসিকতায়, নাগরিক ক্লেদ, বৈকল্য এবং যন্ত্রণায়, সর্বোপরি নাস্তিমূলক জিজ্ঞাসায় যে জীবনচেতনা পরিস্ফুট হয় সেটি তাঁর আস্তিচেতনারই নামান্তর। বাস্তবিক শহীদ কাদরী আগাগোড়া একজন নাগরিক কবি। সে-কারণে তাঁর নগরচেতনার সঙ্গে জীবনচেতনার এক সুগভীর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সমাজে ক্রমবর্ধিষ্ণু নগরায়নই নয় বরং তাঁর কবিতা একটি সুদীর্ঘকালীন নগরজীবনের উত্তুঙ্গ অবস্থার পরিণাম ও আবেগে-অনুভূতির ভেঙে-পড়া, বিচূর্ণিত সত্তার আকুতিই উপজীব্য হয়ে উঠেছে। তবে একথাও ঠিক, শহীদ কাদরী স্ব-কাল, জাতীয়জীবনের ঘটনাবলি ও তাঁর সমসাময়িক আন্দোলন-আলোড়নকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর নগরচেতনায় প্রায়শই উঠে এসেছে পাকিস্তানি শাসনামলের ঔপনিবেশিক নগরচিত্র, যুদ্ধকালীন নাগরিক অবরুদ্ধতা এবং আমাদের মুক্তিসংগ্রামের জীবন্ত নগর-দৃশ্য। এ-অর্থে শহীদ কাদরীর কবিতা পেয়েছে ভিন্নতর মাত্রা। তাঁর নগর শেষ পর্যন্ত কেবলই শুধুই বোদলেয়ারিয় ক্লেদ-বৈকল্যময় কিংবা এলিয়টিয় নগরচিত্রের প্রতিরূপক হয়ে থাকে নি। শেষ পর্যন্ত তিনি নাগরিক অবক্ষয়-চিত্রের নির্বিকার বোহেমিয় দ্রষ্টাতেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখেন নি। জাতীয়জীবনের দুর্বার আলোড়নে তিনি নাগরিকভাবেই সজ্ঞসচেতন হয়ে উঠেছেন। উত্তরাধিকারে'র শহীদ কাদরী সেকারণেই 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'য় আরো বেশি জীবনঘনিষ্ঠ, স্বাপ্নিক এবং দেশাত্মচেতনায় উজ্জীবিত।

তথ্যনির্দেশ

১। সাঈদ-উর রহমান। পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩ পৃ. ২৬৬
২। মাসুদুজ্জামান। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার কবিতা: তুলনামূলক ধারা, ১৯৯৩ ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৬২
৩। সৈয়দ আকরাম হোসেন। বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৮৫ ঢাকা; বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪১
৪। Sad Generation Vol 1 1964
৫। Sad Genaration, ibid,
৬। সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত
৭। মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪
৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫
৯। বৃষ্টি, বৃষ্টি, উত্তরাধিকার, শহীদ কাদরীর কবিতা, সাহিত্যপ্রকাশ, ১৯৯৩ ঢাকা
১০। প্রাগুক্ত,
১১। প্রাগুক্ত,
১২। আমি কিছুই কিনবো না, প্রাগুক্ত
১৩। প্রাগুক্ত

১৪। নশ্বর জ্যোৎস্নায়, প্রাগুক্ত
১৫। নিসর্গের নুন, প্রাগুক্ত
১৬। শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা, বুদ্ধদেব বসু অনূদিত, ১৯৮৮ কলকাতা: দেজ পাবলিশিং পৃ. ১৯
১৭। আলোকিত গণিকাবৃন্দ, উত্তরাধিকার, শহীদ কাদরীর কবিতা
১৮। প্রিয়তমাসু, প্রাগুক্ত
১৯। টেলিফোনে, আরক্ত প্রস্তাব, প্রাগুক্ত
২০। উত্তরাধিকার প্রাগুক্ত
২১। ইদ্রজাল, প্রাগুক্ত
২২। জানালা থেকে, প্রাগুক্ত
২৩। পরস্পরের দিকে, প্রাগুক্ত
২৪। বিপরীত বিহার, প্রাগুক্ত
২৫। রাষ্ট্র মানেই লেফট্ রাইট লেফট্, তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা, প্রাগুক্ত
২৬। নিষিদ্ধ জর্নাল থেকে, প্রাগুক্ত
২৭। ব্ল্যাক আউটে পূর্ণিমায়, প্রাগুক্ত
২৮। এই সব অক্ষর, প্রাগুক্ত
২৯। পাখিরা সিগন্যাল দেয়, প্রাগুক্ত
৩০। তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা, প্রাগুক্ত
৩১। আজ সারাদিন, কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই, প্রাগুক্ত
৩২। প্রাগুক্ত
৩৩। কেন যেতে চাই, প্রাগুক্ত
৩৪। প্রত্যহের কালো রণাঙ্গনে, প্রাগুক্ত
৩৫। এবার আমি, প্রাগুক্ত
৩৬। চাই দীর্ঘ পরমায়ু, প্রাগুক্ত
৩৭। উত্তরাধিকার, উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত
৩৮। ভরা বর্ষায়: একজন লোক, প্রাগুক্ত
৩৯। নিরুদ্দেশ যাত্রা, প্রাগুক্ত
৪০। বেগম আকতার কামাল। ইম্প্রেশনিজম ও বিষ্ণু দে-র কবিতা, সাহিত্য পত্রিকা, পঁয়ত্রিশ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৮, পৃ. ৫৮
৪১। একবার শানানো ছুরির মতো, তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা, শহীদ কাদরীর কবিতা
৪২। এইসব অক্ষর, প্রাগুক্ত
৪৩। ভরা বর্ষায় একজন, উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত
৪৪। আইখম্যান আমার ইমাম, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, প্রাগুক্ত
৪৫। নপুংসক সন্তের উক্তি, প্রাগুক্ত
৪৬। উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত
৪৭। ইন্দ্রজাল, প্রাগুক্ত
৪৮। প্রত্যহের কারো রণাঙ্গনে, উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত
৪৯। Herbert Read, Collected Essays in literary criticism, p. 50
৫০। শেষ বংশধর, তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা, শহীদ কাদরীর কবিতা
৫১। চন্দ্রাহত সাক্ষাৎ, উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত